গবাদি - ২

কিছুদিন আগে আমার গবাদি - ১ লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন যে আবার গবাদি নিয়ে পড়লাম কেন? আর কোন বিষয়বস্তু ছিল না?

আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে গবাদি - গরু ও গরু সদৃশ গৃহপালিত প্রাণী যথা মোষ। কিন্তু ছাগল ভেড়া নয়। হাঁস-মুরগিরা তো নয়ই, তারা একেবারেই অন্য ক্যাটেগরিতে পড়ে গৃহপালিত প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও, কারণ এরা গরু সদৃশ নয়। কিন্তু ধোপার গাধা? ---- যাক গে, আমি এসব সূক্ষ্ম শ্রেনী-বিভাজনের কচকচির মধ্যে যেতে চাই না। আমার বক্তব্য শুধু এই যে গবাদি আমাদের জীবনের এক পরম অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তাদের যোগ্য স্বীকৃতি পায়নি। আমরা গবাদিকে সহজলভ্য বলে ধরে নিয়েছি।

আয়তলোচনাদের মৃগনয়নী বলা হয়। গরুনয়নী নয় কেন? এটা শুধু পরিবেশের ব্যাপার। হরিণ দূরে দূরে থাকে। গাছপালার আড়াল থেকে শুধু ঝলক দেখিয়ে সরে যায় (যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় ----)। অথচ গরু? নিজে থেকে কাছে এসে গা ঘেঁসে দাঁড়ায়, গা চেটে দেয়, শাড়ির আঁচল অথবা কোঁচার খুঁট যা নাগালে পায় টেনে নিয়ে পরম পরিতোষে তারিয়ে তারিয়ে খায়। বেশী কাছাকাছি হলে গ্ল্যামার বা tantalising ভাবটা আর থাকে না। বলতেই বলে "গেঁয়ো যোগি ভিখ্ পায় না।" গবাদির ক্ষেত্রেও তাই।

বর্তমান রচনাটির এবংবিধ শিরোনাম এই পরিপ্রেক্ষিতেই। পাঠক এটিকে অবহেলিত গবাদি-গোষ্ঠির ক্ষতিপূরণের যৎকিঞ্চিৎ প্রয়াস বলে ধরে নিতে পারেন।

আমার এ কাহিনীর মূলে হল ঈশানী। শুধু মূলে নয়, মূল। চরিত্র, চারণ এবং আরও অনেক কিছু। বহু বছর ধরে আমাদের ফ্ল্যাটবাড়িতে কাজের লোকের ছায়া পড়েনি, পায়ের ধুলো তো নয়ই। দু'বছর আগে হাসপাতালে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে বাড়ি এলাম। তারপর বাড়িতেও সুদীর্ঘকাল বিছানায় কাটলো। ততদিনে ঈশানী এ বাড়িতে কায়েম হয়ে বসেছে। শুনলাম কাজের লোক ছাড়া আর আমার চলবে না। কাজের লোক ছাড়ানোর কথা যেন কোনদিন

স্বপ্নেও মনে স্থান না দিই।

কাজের লোক হিসেবে ঈশানী চলনসই হলেও ওর একটা ব্যাপার অসহ্য রকম বিরক্তিকর লাগতো আমার। অতি ধুরন্ধর ফাঁকিবাজ, যদ্দূর হতে পারে। ও যতক্ষণ আমার বাড়িতে থাকবে ছায়ার মত ওর সঙ্গে লেপটে থাকতে হবে আমায়। বিকল্প সম্ভাবনা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে গিয়ে জানলাম আমার সমস্যার সমাধান নেই। বরং মনিব হিসেবে আমি অসাধারণ ভাগ্যশালী যে ঈশানীকে পেয়েছি। ঈশানী যখন তখন দুদ্দাড় কামাই করে না। রোজ তার বাঁধা সময়টিতে আসে। এছাড়া হাতটান নেই। শুধু যতক্ষণ কাজ করবে ঠায় পাশে পাশে থাকতে হবে আমায়। যে কাজটি দেখবো না সেটি দিব্যি কাট্ করে দেবে। ঘড়ি মিলিয়ে দেখেছি। ঘরে ঢোকার কুড়ি মিনিটের মধ্যে "গেলাম মাসিমা" বলে চম্পট।

অগত্যা ভবিতব্যকে মেনে নিতে হল। সাড়ে দশটায় কাজে আসে ঈশানী। তার আগেই চা জলখাবার খাওয়া, স্নান করা এই সব অবশ্যকরণীয় কাজগুলো সেরে নিই। বাকি কাজগুলো স্থগিত রাখি ঈশানী যাবার পর করবো বলে। প্রতিদিন ঝাড়া এক ঘণ্টা ঈশানীকে পাহারা দেবার ডিউটি। হ্যাঁ, সব কাজগুলো ঠিক ভাবে করার জন্যে পুরো এক ঘণ্টা সময় নেয় ইশানী। হাতের সঙ্গে মুখও চলতে থাকে তার। কথার ফুলঝুরি ছোটে সমানে। ক্রমে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। ঝকঝকে ঘরের মেঝে, নিখুঁত বাসনমাজা - ডাস্টিং; মাঝে মধ্যে মশলাপাতি বাটা, কুটনো কোটা। ঈশানী নিপুণ হাতে কাজ করে যায় আর সেই সঙ্গে গল্পের জাল বোনে।

দেশে-গাঁয়ে মাটির ভিটেয় ওর বাবা-মা থাকতো ওদের তিন ভাইবোনকে নিয়ে। ঈশানী সবার বড়। বাবা বড়লোকের খেতে কাজ করে যা রোজগার করতো তাতে সারা বছর কুলোতো না। দিনের পর দিন শকরকন্দি সিদ্ধ খেয়ে থাকতে হত তাদের। শকরকন্দি খেতে একটুও ভাল লাগতো না ঈশানীর। ভাতের জন্যে কাঁদাকাটি করতো। মায়ের কাছে মার খেয়েছে কতদিন। মেয়েকে মেরে মা আড়ালে লুকিয়ে কাঁদতো। মাত্র একটা জামা ছিল ঈশানীর। সে জামা গা থেকে নামতো না কোনদিন। পুকুরে স্নান করে ভিজে জামা পরে ঘুরে বেড়াতো। গায়েই শুকিয়ে যেতো জামা। ছোট বোন ও ভাই শুধু ইজের পরে থাকতো।

পাশেই ওদের এক দূর সম্পর্কের খুড়োর বাড়ি ছিল। খুড়োর অবস্থা কথঞ্চিৎ ভাল। খুড়তুতো ভাইবোনেরা দাওয়ায় বসে ছাতু খেতো আর ঈশানী সঙ্কুচিত মুখে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়া দেখতো।

একদিন খুড়তুতো ভাই একমুঠো লঙ্কা মাটিতে রেখে বললো, "তুই যদি পাঁচটা লঙ্কা খাস তবে একমুঠো ছাতু দেবো।"

ঈশানী তৎক্ষণাৎ রাজী।

খুড়তুতো দাদা বললো, "না, পাঁচটা নয়, আটটা লঙ্কা খেলে তবে একমুঠো ছাতু পাবি।"

ঈশানী বললো, "আমি গঁৎ গঁৎ করে আটটা লঙ্কা গিলে ফেললাম মাসিমা। ছাতুটা খাবার আগে একবার মনে হয়েছিল ভাইবোনের কথা। তারপর খিদের জ্বালায় নিজেই খেয়ে ফেললাম সবটুকু ছাতু। এরপর থেকে ওরা মজা দেখার জন্যে প্রায়ই আমায় ছাতু খেতে ডাকতো।"

এর কিছুদিন পরে, গাঁয়ের লোক যারা শহরে চলে এসেছে তাদের কারো কাছে শহরের মানুষের অঢেল ঐশ্বর্য ও শহরের যত্রতত্র টাকা কামানোর অজস্র সুযোগ সুবিধার কথা শুনে ঈশানীর বাবা-মা ছেলেপুলে নিয়ে শহরে চলে আসে। বাড়ি তৈরীর কাজে বেলদারি (ইঁট বওয়ার কাজ) করতো ওরা। ঈশানীর হাঁটার ভঙ্গিটা ভারী অদ্ভুত লাগতো আমার। এখন বুঝলাম বহু বছর বেলদারি করে ওটা ওর মজ্জাগত হয়ে গেছে। এখনও মাথায় অদৃশ্য ইটের পাঁজা (একসঙ্গে ন'টা ইট বইতো ঈশানী) নিয়ে বুক চিতিয়ে থুতনি উঁচিয়ে হাঁটে। ঈশানীকে জিজ্ঞেস করায় ও হিসেব কষে বললো প্রায় বিশ বছর বেলদারি করেছে সে। আট বছর বয়সে শহরে এলো বাবা-মা'র সঙ্গে। ঈশানীকে ভাই-বোন ও সংসার আগলানোর ভার দিয়ে ওর মা-ও বাবার সঙ্গে বেলদারি করতে লাগলো। কয়েক বছর পর ঈশানীও যোগ দিলো। অনেক বছরের চেষ্টায় পাঁচ হাজার টাকা জড়ো করে বাবা-মা ঈশানীর বিয়ে ঠিক করলো।

ঝাঁটাটাকে খাঁড়ার মত উঁচিয়ে ধরে ঈশানী উত্তেজিত গলায় বললো, "এমন হারামী আমার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা মাসিমা, আমার বাবাকে ঠকিয়ে ছেলের বিয়ে দিলো।"

ঈশানীর বাবার মনোগত বাসনা ছিল মেয়েটার একটু লেখাপড়া জানা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবে। ঈশানীর হবু শ্বশুরবাড়ির লোকেরা একথা জানতে পেরে আগে থেকে সাঁট করে রাখলো। ঈশানীর বাবা ছেলে দেখতে এসে দেখে পাত্র একখানা বই নিয়ে এক মনে পড়ছে। দেখেই তার প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। পাত্রের বয়সটা

একটু বেশীর দিকে। ওরা বাইশ বললেও চেহারা দেখে ত্রিশের কোঠায় মনে হয়। রংটা বেজায় কালো। তার উপর কথা বলতে গেলে দারুণভাবে তোৎলায়। তবুও মুখের সামনে বই ধরে তার ঠোঁট নাড়ার বহর দেখে হবু শ্বশুর একেবারে মোহিত হয়ে গেল।

ঈশানীর বিয়ে হয়ে গেল। আট ক্লাস অবধি পড়া পাত্তরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পরিতুষ্টি একটা গোটা দিনও ভোগ করতে পারলো না ঈশানীর বাবা-মা। বিয়ের পর কন্যাপক্ষ কিছু টাকা গুঁজে দিয়েছিল জামাইয়ের হাতে। পরদিন সজ্জে তুলুনির জন্যে একান্ন টাকা চাইতে এলে বর টাকাগুলো একবার এহাতে নেয় একবার ওহাতে। একান্নটা টাকা আর কিছুতেই গুণে উঠতে পারে না। (ঈশানী আমাকে বলেছিল ওর শ্বশুর নাকি ছেলের মজুরির সব টাকা দালালের কাছ থেকে নিয়ে নিতো বরাবর। তাই অত বয়স অবধি ঈশানীর বর টাকা চিনতে বা গুণতে পারতো না।)

সজ্জে তুলুনির ঘটনা থেকেই সবাই যা বোঝার বুঝে নিলো। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। বাসর সজ্জে হয়ে গেছে। ওই কালো তোৎলা লোকটাই ইশানীর স্বামী, ওর সঙ্গে সারাটা জীবন কাটাতে হবে তাকে। ভাগ্য আর কর্মফলের দোহাই দিয়ে মেয়েকে এদের হাতেই সঁপে দিলো ঈশানীর বাবা-মা। ঈশানীর বাবা চোখ মুছতে মুছতে ঈশানীকে তার স্বামী, শ্বশুর ও বরযাত্রিদের সঙ্গে ভাড়া করা টেম্পো-গাড়িতে তুলে দিলো। ঈশানীর মা দূরে দাঁড়িয়ে ঘোমটার আড়ালে কাঁদছিল কেবল। কোন কথা বলেনি।

ঈশানী শ্বশুর বাড়িতে এসে বিয়ের শাড়ি আর সিঁথি ভর্তি মেটে সিঁদুর পরে পর দিন থেকে বেলদারি শুরু করে দিলো। ওর শ্বশুর দালালকে বলে পুত্রবধূর জন্যে কাজ ঠিক করে রেখেছিল। ঈশানীর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা শুধু পাত্তরের লেখাপড়ার ব্যাপারেই মিথ্যে বলেনি। আরও ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলেছিল ওরা। যে ঝুপড়িটায় ওরা থাকতো সেটা ওদের নিজেদের বলেছিল। সেটা অন্যলোকের। ওরা ভাড়াটে, প্রতিমাসে ভাড়া গুণতে হ'ত। ব্যাঙ্কে আট হাজার টাকা আছে বলেছিল। আসলে ওদের আট হাজার টাকা দেনা ছিল বাজারে।

গত বিশ বছর উদয়াস্ত গতর খাটিয়ে অনেক কিছু করেছে ঈশানী। নিজেদের ঝুপড়ি কিনেছে। আরও একটা ঝুপড়ি কিনে ভাড়া খাটাচ্ছে। পুরো দেনা চুকিয়ে

দিয়েছে। স্বামীকে রিক্সা কিনে দিয়েছিল কিস্তিতে। ওর স্বামী বছর কয়েক রিক্সা চালালো। তারপর অন্য রিক্সাওলাদের সঙ্গে মিশে নানারকম বদ নেশা ধরায় ঈশানী রাগ করে রিক্সা বেচে দিয়েছে। ওর স্বামী এখন আবার বেলদারি করছে। দেশে শ্বশুরের ভিটেয় পাকা ছাদ তোলার পরিকল্পনা ঈশানীর। পঞ্চাশ হাজার টাকা জমে গেলেই কাজ শুরু করবে।

আমার বাড়িতে প্রায় তিন বছর হয়ে গেছে ঈশানীর। হেনকালে তার পরিবারে দারুণ এক দুর্যোগ ঘটলো। ওর বুড়ি শাশুড়ি হঠাৎ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেল। সরকারী হাসপাতালে ভর্তি হল বুড়ি। ক'দিন পরে ছাড়া পেয়ে ফিরে এলো। শুনলাম প্রাণের ভয় আপাতত নেই তবে অবস্থার উন্নতির আশা ক্ষীণ। অনেক ভেবেচিন্তে শাশুড়িকে দেশে পাঠানো ঠিক হল। বুড়ি নিজের ভিটেয় প্রাণ রাখতে পারবে তাহলে। শ্বশুর সঙ্গে যাবে। ঈশানীর স্বামীও যাবে। বুড়ো-বুড়িকে দেখাশোনার লোক চাই। ঈশানীর স্বামী রান্নাবান্নার কাজও পারে খানিকটা। ঈশানী ছ'টা বাড়িতে ঠিকে খেটে সংসার চালায়। কাজেই তার এখান থেকে নড়া চলবে না। স্বামীর বেলদারির উপার্জনের টাকার ভরসা নেই। ঈশানী যদি শাশুড়িকে নিয়ে দেশে চলে যায়, ঈশানীর স্বামী মদ-জুয়ায় মাতবে আবার। ওর রোজগারের কানাকড়িও ঘরে আসবে না। তার চাইতে দেশে গাঁয়ে বরং ভাল থাকবে।

পক্ষাঘাতের রুগী নিয়ে লম্বা ট্রেন যাত্রা মুখের কথা নয়। ঈশানী খুব যত্ন নিয়ে বিশদ ব্যবস্থা করলো। ও যে-কটা বাড়িতে কাজ করতো সেই গিন্নিরা সবাই খুশি মনে টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য করলাম। আজকালকার দিনে বুড়ি শাশুড়ির জন্যে কটা বউ এতখানি করবে? দেখেও আনন্দ হয়।

মাস দুয়েক কেটে গেছে। প্রথম দিকে একটা টেনসন ছিল। আমরা রোজই খবর নিতাম শাশুড়ি কেমন আছে। কখনও একটু ভাল - বুড়ি নাকি কথা বলছে, খাচ্ছে। আবার কখনো শুনি অবস্থা খারাপের দিকে বাঁক নিয়েছে। কথা বন্ধ। খাওয়া-ও তাই । এর মধ্যে দু'বার ওরা নাকি বিছানা থেকে নামিয়ে বাইরে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিল বুড়িকে। ঘরের মধ্যে খাটে শুয়ে প্রাণবায়ু বার হলে আত্মা মুক্তি পাবে না। ওখানেই ঘরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করবে অনন্তকাল ----।

ঈশানী বললো, "একেবারে শেষ খবরটা এলে তবেই আমি দেশে যাবো।

তার আগে উটকো খবর পেয়ে ওখানে গেলে আটকে পড়বো মাসিমা। শাশুড়ি মারা গেলে দেশে গিয়ে শ্রাদ্ধ-শান্তি সব কিছু মিটিয়ে আসতে কমপক্ষে হপ্তা তিনেক তো লাগবেই।"

আমরা ছ'বাড়ির গিন্নিরা ভয়ে ভয়ে থাকি এই বুঝি খবর এলো বুড়ি আর নেই। মনে মনে তার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

একদিন ঈশানী বললো, "মাসিমা কাল আমার স্বামী ফোন করেছিল। বললো ওখানে এতদিন যখন থাকতে হবে ও ভাবছে গরু পুষনি নেবে।"

"পুষনি মানে?"

শুনলাম কেউ ওকে একটা বাছুর দেবে। সেই বাছুরটা বড় হলে তার যখন বাছুর হবে আগের বাছুরের দুধ আর সেই নতুন বাছুরের মালিকানা পুরোপুরি ঈশানীর স্বামীর হবে। তারপর আবার দ্বিতীয়বার বাছুর জন্মাবে যখন, যে লোকটি বাছুরটা শুরুতে ঈশানীর স্বামীকে দিয়েছে, তারও অংশ থাকবে তাতে।

বলতে বাধা নেই ছোটবেলা থেকে গরুদের প্রতি পক্ষপাতীত্ব থাকলেও এই বাছুর থেকে গরু - গরু থেকে বাছুর - আবার বাছুর থেকে ---- এসব ব্যাপারে আমার ব্যবহারিক জ্ঞান খুব কম। তবু এই সুদীর্ঘ যোজনার কথা শুনে মনে কেমন খট্‌কা লাগলো। ঈশানীর বুড়ি শাশুড়ির "এখন-তখন" অবস্থাটা ঠাকুরের কৃপায় আপাতত একটু ঢিলে দিলেও অতখানি সময় ওরা হাতে পাবে কি?

শুধোলাম, "তা তুমি তাকে কি বললে?"

ঈশানী প্রসন্ন মুখে বললো, "বললাম পুষনি নিয়ে নাও, ভালই তো।"

এর কিছুদিন পরে এমন একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটলো যার বর্ণনা করতেও আমার খারাপ লাগছে। কিন্তু গল্প লিখতে বসে গল্পের সার অঙ্গ বাদ দেওয়া যায় না। অগত্যা লিখতে বাধ্য হলাম -----।

আমাদের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় দিল্লীতে কোনও কাজে এসেছিলেন। কিছুদিন আমাদের বাড়িতে ছিলেন। তার সঙ্গে দেখা করতে চেনাজানা অনেকেই আসতেন। সেই সপ্তাহটা খুব হৈ চৈ করে কাটলো। সব সময় বাড়ি সরগরম থাকতো। শনিবার সকালের প্লেনে আত্মীয়টি চলে যাবেন। রাত্রে জিনিসপত্র গোছগাছ করে রাখলেন। রাতের খাওয়া দাওয়া সকাল সকাল সেরে নেওয়া হল। খাওয়ার পর কাকে জানি ফোন করতে গিয়ে ভদ্রলোক তাঁর দামী

ব্ল্যাকবেরীটি খুঁজে পেলেন না। তন্ন তন্ন করে সারা বাড়ি খুঁজে কোথাও ব্ল্যাকবেরীর হদিস পাওয়া গেল না। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল আমার। এই ক'টা দিন ঈশানী সন্ধ্যাবেলা এসে পরোটা বানিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। আমার খুব সুরাহা হত এতে। আজও সন্ধ্যাবেলা পরোটা বানিয়ে রান্নাঘরে কিছু কিছু বাসন ধুয়ে রেখে সাতটার সময় আমাদের বাড়ি থেকে গেছে। দুপুর বেলা ভদ্রলোক শেষ ব্ল্যাকবেরী ব্যবহার করেছেন বেলা আড়াইটে নাগাদ। তারপর রাত আটটায় দেখলেন সেটা নেই।

আমার স্বামী তক্ষুণি কলোনীর সিকুরিটিতে খবর দিলেন। গেটের কাছেই পুলিস পোস্ট। তাদেরও জানানো হল। ওরাই ঈশানীর ঝুপড়িতে গিয়ে তাকে নিয়ে এলো। সওয়াল যা করার পুলিসই করলো। আমি শোবার ঘরে ঢুকে রইলাম। কিছুতেই ঈশানীর সামনে যেতে পারলাম না। এক অদম্য অনীহা যেন চারিদিক থেকে ঘিরে ধরলো আমায়। ভদ্রলোক সকালের ফ্লাইটে চলে গেলেন। আট দশ দিন পরে আমাদের কাছে খবর এলো ব্ল্যাকবেরী পাওয়া গেছে। আমাদের বাড়ির পাশের পার্কে সেটিকে পড়ে থাকতে দেখে প্রতিবেশীর ছেলে (অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে, কিন্তু নেশার সামগ্রী কেনার জন্যে নানাভাবে পয়সা জোগাড়ের ফিকির খোঁজে) সেটা তুলে এনে কাউকে বিক্রি করার চেষ্টা করছিল। হবু খদ্দেরের সন্দেহ হওয়ায় পুলিসে খবর দেয়।

ধূমপানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে অনেকে প্রকাশ্যে সিগারেট খেতে কুণ্ঠা বোধ করেন। আমাদের আত্মীয়টিও এই কয়দিন আড়ালে গিয়ে ধূমপান করতেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ির পাশের পার্কে বসে সিগারেট খাওয়ার সময় ব্ল্যাকবেরীটা বেঞ্চের উপর রেখেছিলেন। ওঠার সময় সেটা আর নিয়ে আসেননি। ওখানেই ফেলে এসেছেন।

ওই ঘটনার পর ঈশানী আর এ পাড়ায় আসেনি। বছর পাঁচেক পর একদিন হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মঙ্গলবারে হাট বসে। সারি সারি সবজির দোকান। একটা দোকানের সামনে উবু হয়ে ঘাড় নীচু করে বসে একমনে সবজি বাছাই করছিল ঈশানী। সঙ্গে বছর তিনেকের একটা ছেলে। আমি পিছন থেকে দেখে ঈশানীকে চিনতে পারিনি। চিনতে পারলে ওখানে দাঁড়াতাম না। পাশ কাটিয়ে একটু দূরে অন্য দোকানে যেতাম। ওর প্রতি আমাদের সেদিনকার অন্যায় আচরণের গ্লানি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। ঈশানী আমায় দেখে উঠে

দাঁড়ালো।

বললো, "ভাল আছ মাসিমা?"

মনে মনে ভারী অবাক হলাম। ওকে যে আমরা অন্যায়ভাবে সন্দেহ করেছিলাম, তার জন্য অভিযোগের লেশমাত্র আভাস নেই ওর মুখে।

বললাম, "ভাল আছি।"

ও কেমন আছে জিজ্ঞেস করতে বাধলো।

সঙ্কুচিত গলায় শুধোলাম, "তোমার শাশুড়ি?"

"গত বছর মারা গেছে। একদম সেরে উঠেছিল মাসিমা। এখানে ফিরে এসেছিল।"

জিজ্ঞেস করলাম, "এই বাচ্চাটা কে?"

নিরুত্তেজ গলায় বললো, "এর নাম গোপাল।" তারপর একটু থেমে বললো, "দেশে আমার স্বামী দুধের ব্যবসা ধরেছিল। এর মা গরুদের দেখাশোনা করতো। এ আমার সতীনের ছেলে মাসিমা।"

অদূরে কমলালেবু বোঝাই একটা ঠেলাগাড়ি দাঁড়িয়েছিল। আমি নিজের হতচকিত ভাবটা কাটাতে তাড়াতাড়ি সেইদিকে এগিয়ে গেলাম। ঈশানী মাটিতে উবু হয়ে বসে আবার সবজি বাছতে লাগলো।